চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ

শাইখ আবু উবাইদ আল-কুরাইশী

বর্তমান সময়ে 'মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়' এই উম্মাহর মাঝে এতো ব্যাপক পরিমাণ ছড়িয়েছে যে ভাবলে খুবই অবাক লাগে। আরও অবাক করা বিষয় হল – যে সকল ব্যক্তিদের মাঝে সর্বপ্রথম এই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে আলিম উলামারাই। অথচ তাঁদেরই দায়িত্ব ছিলো এই ফেতনা থেকে উম্মাহকে রক্ষা করা। যেন বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এবং হক্ব টিকে থাকতে পারে।

কিছুদিন পূর্বে[1], মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাজিত কয়েকজন আলেম, আফগানিস্তানে চলমান আমেরিকান আক্রমণ সম্পর্কে এক স্যাটেলাইট চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলো।

তাদের একজনের বক্তব্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুজাহিদিদের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার পক্ষে সাফাই গেয়ে সে বলছিলো – "আমেরিকা এবং এর সহযোগীদের সামরিক সক্ষমতা এবং মুজাহিদদের সামরিক সক্ষমতার মাঝে এখন কোনো সমতা নেই। আমেরিকা অনেক অনেক এগিয়ে। তাই এখন আর কোনো জিহাদ নেই। জিহাদের পক্ষে তাই আমাদের কোনো সমর্থনও নেই"।

কথা শুনে মনে হলো সে আমেরিকার পক্ষে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। শুরুতেই হার মেনে নিয়েছে। তার এই বক্তব্য স্পষ্ট করে দিলো সে, ইসলামী আইন, ইতিহাস এবং পশ্চিমাদের বর্তমান সামরিক শক্তির বিশ্লেষণ সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপারে কতটা অজ্ঞ। তার অজ্ঞতার বিষয়টি আমাদের সামনের আলোচনা থেকে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাবে ইনশা আল্লাহ।

বছরের পর বছর ধরে আমরা সবাই ফিলিস্তিনের 'ইন্তিফাদা'র খবরগুলো নানা সংবাদমাধ্যম থেকে জেনে আসছি। আমরা দেখছি – শিশুরা পর্যন্ত সর্বাধুনিক সামরিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত ইহুদী সৈন্যদের উপর পাথর এবং পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মারছে। দিনে দিনে আহতদের সংখ্যা বাড়ছে ফিলিস্তিনি শিবিরে। কিন্তু এতোকিছুর পরেও তাঁরা প্রতিজ্ঞা থেকে পিছু হটেননি। উল্টো আমরা দেখছি ফিলিস্তিনে জিহাদি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া দলগুলো দিন দিন আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হচ্ছে আক্রমণের গুণগত মান ও সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

এই ছবিগুলো, এই দৃশ্যগুলো সত্যিকার অর্থেই আমাদের বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল। অনুপ্রাণিত করেছিল। এগুলো সাহস ও দৃঢ়তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এই ছবিগুলোর কিছু অন্যরকম ব্যবহারও দেখা গিয়েছে।

১৯৮৯ সালে ইন্তিফাদার ছবি দেখে, সংবাদ জেনে আমেরিকার কয়েকজন সামরিক বিশেষজ্ঞ লড়াইয়ের পদ্ধতি এবং যুদ্ধ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে আমূল এক পরিবর্তনের আভাস পায়। এসব মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটা ধারণা করেছিলো যে – একবিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ যুদ্ধের রূপ ফিলিস্তিনের ইন্তিফাদার মতই হবে।

মার্কিন এই বিশেষজ্ঞরা যুদ্ধের নতুন এই পদ্ধতির নাম দিয়েছে "চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ"। কেউ কেউ এটাকে "অসম যুদ্ধ/অসমতার যুদ্ধ"ও বলে থাকে। সমর ইতিহাসবিদদের কাছে সুপরিচিত যে, শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী যুগের যুদ্ধগুলি তিনটি মৌলিক বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। এগুলো হল-

প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধ – প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধ সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। আদ্দিকালের বন্দুক দিয়ে সৈন্যরা লড়াই করতো।

দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ- আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে এই পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এ যুদ্ধরীতির মূল লক্ষ্য ছিল শত্রুর অর্থনীতিতে আঘাত করা, প্রথমে রাইফেল এবং পরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ শত্রু সেনা হত্যা করা।

তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ- তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধে, আগের দুই প্রজন্মের তুলনায় বেশ কিছু কৌশলগত পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনাবাহিনী এই পদ্ধতির ওপর চরম দক্ষতা অর্জন করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল ট্রেঞ্চ নির্ভর। শত্রুর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়ানো। তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধে আক্রমণের এ পদ্ধতি বদলে যায়। গ্রহণ করা হয় ট্যাংক, বিমান ইত্যাদির সাহায্যে শত্রুবাহিনীকে পাশ থেকে বা পেছন থেকে আক্রমণ করার পদ্ধতি। যেখানে শত্রুরা তুলনামূলক দুর্বল অবস্থায় থাকে।

বিশেষজ্ঞরা বারবার জোর দিয়ে বলছে, "চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ একটি নতুন ধরণের যুদ্ধ। লড়াই এখন তীব্র মাত্রায় ছড়িয়ে পড়বে। লড়াই বলতে আগে যেমন শুধু সামরিক যুদ্ধ বোঝাতো এখন তেমনটা থাকবেনা। গতানুগতিক যুদ্ধের ময়দানও পরিবর্তন হয়ে যাবে। আগে ময়দান বলতে যা বুঝাতো তা এখন আর অল্প কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দান হবে বিশাল ও ব্যাপক। অনেকগুলো সম্প্রদায় একসাথে যুদ্ধ করবে। রেগুলার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করা এই যুদ্ধের একমাত্র সামরিক উদ্দেশ্য থাকবেনা। বরং সেনাবাহিনী ধ্বংসের পাশাপাশি এই শত্রুবাহিনী যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সে সম্প্রদায়ে শত্রুবাহিনীর জনপ্রিয়তা নষ্ট করা ও সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার মনোভাব ধ্বংস করা -এগুলোও সামরিক লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিউজ বুলেটিন, অনেকগুলো সাঁজোয়া ব্রিগেডের তুলনায়ও প্রাণঘাতী হয়ে হয়ে উঠবে। যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধক্ষেত্র বা ফ্রন্ট থাকবে না তাই যুদ্ধ এবং শান্তিকালিন সময়ের পার্থক্য ঝাপসা হয়ে আসবে"।

পাশ্চাত্যের অন্যান্য সমরবিদরা বলছে, 'ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলোতে শত্রুপক্ষের সমর পরিকল্পনাকারীদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা প্রাধান্য পাবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্বের মতো শুধু যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হবে তা নয়, বরং নিজেদের কাছে থাকা সব রকম মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণ ও ক্ষমতাশীলদের মতামতকে প্রভাবিত করা হবে। কৌশলগতভাবে, 'চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ' আকারে ছোট হবে কিন্তু এই যুদ্ধ একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়

চলতে থাকবে। এই যুদ্ধে শত্রুর দৃশ্যমান উপস্থিতি তেমন থাকবে না। শত্রু হঠাৎ করেই এক অঞ্চলে দেখা দিবে আবার সহসাই ভূতের মতো মিলিয়ে যাবে'।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধগুলোতে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর যুদ্ধে ব্যবহৃত যুদ্ধকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আগের প্রজন্মগুলোর মতো যুদ্ধ শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। এই যুদ্ধে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে লড়াই চলবে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, গোত্রীয়, অঞ্চলভিত্তিক এমনকি সাংগঠনিক পর্যায়েও!

নতুন ধরণের এই যুদ্ধ পশ্চিমা সেনাবাহিনীকে অনেক প্রতিকূলতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিবে। এবং যেমনটা ধারণা করা হচ্ছে এই প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য পাশ্চাত্যের সামরিক বাহিনী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে। নতুন করে ঠিক করবে কোন কোন বিষয়গুলোকে তারা প্রাধান্য দিবে। পশ্চিমা বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি বা যুদ্ধ কৌশলের এই পরিবর্তন কোনো কারণ ছাড়া এমনি এমনি হয়নি। যুদ্ধের মাধ্যমেই হয়েছে। চতুর্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধ আসলে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এবং স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এই যুদ্ধে যারা খাতাকলমে দুর্বল, ময়দানে তারাই এগিয়ে থাকে। হায়! উম্মাহর কাপুরুষরা যদি এসব জানতো!

প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অনেক যুদ্ধেই এমন মানুষদের হাতে পরাজিত হয়েছে যাদের কোনো রাষ্ট্রই নেই। এখানে আমাদের অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মাথায় রাখতে হবে। মুসলিম উম্মাহ সাম্প্রতিক সময়ে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে অসংখ্য বিজয় লাভ করেছে। উসমানী খিলাফাত পতনের পর এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বিজয়ের স্বাদ উম্মাহ আর পায়নি।

অস্ত্র, প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীগুলোর (আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সোমালিয়ায় আমেরিকা, চেচনিয়ায় রাশিয়া) বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ এই বিজয়গুলো পেয়েছে গত ২০ বছরে। এসকল যুদ্ধের ময়দানগুলোর ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যতা ছিল। কোথাও পাহাড় পর্বতে যুদ্ধ হয়েছে, কোথাও মরুভূমিতে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শহরে।

মুজাহিদরা আফগানিস্তানে, সামরিক দিক থেকে বিশ্বের তৎকালীন দ্বিতীয় শক্তিশালী বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। মুজাহিদদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে রাশিয়ানরা ১৯৮৮ সালে আফগানিস্তান থেকে পালাত বাধ্য হয়। এর তিন বছর পরে রাশিয়া সমর্থিত আফগান সরকারকেও মুজাহিদরা পরাজিত করেন। একইভাবে, সোমালিয়ার একটি গোত্র আমেরিকাকে নাকানি চুবানি খাওয়ায়। সোমালিয়ানদের হাতে অপমানিত হয়ে আমেরিকানরা সোমালিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

এর কিছুদিন পরেই চেচেন মুজাহিদরা, রুশ ভাল্লুকদের অপমান করে চেচনিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হবার সময়কাল ছিল ১৯৯৪-১৯৯৬ সাল। বিজয়গুলোর বেশিরভাগই মুজাহিদদের অস্ত্র সংখ্যার কারণে আসেনি। আর এটি আমাদের আলোচনার বিষয়ও নয়।

আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু সামরিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা। আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আমেরিকা ও মুজাহিদদের মধ্যকার সামরিক শক্তির তথাকথিত 'অসমতা' নিয়ে। কারণ অনেকেই আমেরিকার সামরিক সক্ষমতাকে অনেক বড় মনে করে। পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন এ সকল লোকজন যুদ্ধ শুরু হবার আগেই পরাজয় মেনে নিয়েছে। মুজাহিদদের প্রতিরোধ ও বিজয়ের ইতিহাস, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এসব মানুষ অবগত নয়। আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নেয়া এসকল মানুষের ভুল ভাঙ্গানো।

আমেরিকা বা রাশিয়ার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদের কাছে যে প্রযুক্তি ও অস্ত্র (পারমানবিক, রাসায়নিক, বায়োলজিক্যাল) ছিল তা দিয়ে পুরো পৃথিবী কয়েকবার ধ্বংস করা যেত। অথচ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এগুলো তাদের কোন কাজেই আসেনি।

মুজাহিদরা তাদের হালকা অস্ত্র দিয়েই চতুর্থ প্রজন্মের এ যুদ্ধে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তাদের সফলতার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হল তারা সাধারণ জনগণেরই অংশ। তারা জনগণের মাঝেই মিশে থাকেন। আর এভাবেই তারা পরাশক্তিদের অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ এই অস্ত্রগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যেগুলো সফলভাবে তখনই কাজ করতে পারবে যখন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু থাকবে। খোলা ময়দান থাকবে। কিন্তু মুজাহিদরা জনগনের ভেতরে মিশে থাকায় এই অস্ত্রগুলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু পায়না। নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

মুজাহিদদের জনগণের সাথে মিশে থাকার এই কৌশল সম্পর্কে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়য়ের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা মাইকেল ভিকার্স মন্তব্য করে, "আমাদের এমন অনেক অস্ত্রশস্ত্র বা সামরিক সক্ষমতা রয়েছে যেগুলো এ ধরণের যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত নয়"। (অর্থাৎ আমাদের অনেক অস্ত্র থাকলেও, আমাদের অনেক সামরিক সক্ষমতা থাকলেও জনমানুষের সাথে মিশে থাকে মুজাহিদদের মোকাবেলায় এই সক্ষমতা কোন কাজে আসবে না।)

সৈন্যসংখ্যার দিক থেকে আগের যুদ্ধগুলো বিচার বিশ্লেষণ করলে তার এই দাবির সত্যতা পাওয়া যায়। ১৯৭৯ এর শেষদিকে রাশিয়ান রেড আর্মি, আফগানিস্তানে ১ লাখেরও বেশি সেনা মোতায়েন করেছিল।

শুরুতে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ ছিল না। ১৯৮৫ সালে মুজাহিদরা সংখ্যার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল। তখনও সোভিয়েত সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদদের সংখার অনুপাত ছিল ৫:২ (অর্থাৎ প্রতি ৫ জন রুশ সৈন্যের বিপরীতে মুজাহিদ ছিলেন ২ জন)।

সোমালিয়ায় মুজাহিদরা সংখ্যা ও অস্ত্রের দিক থেকে যে অবস্থায় ছিল তাতে আমেরিকার জন্য সেখানে হামলা চালানো, জয়ী হওয়া এবং নিরাপদে ফিরে আসা ছিল মামুলি ব্যাপার। আমেরিকানরা ৪০ হাজার সেনা নিয়ে সোমালিয়া আক্রমণ করেছিল। সোমালিয়ায় মুজাহিদদের সংখ্যা যখন সর্বোচ্চ ছিল তখনও আমেরিকান বাহিনীর সাথে তাদের সংখ্যার অনুপাত ছিল ১:২০ (অর্থাৎ প্রতি ২০ জন আমেরিকান সৈন্যের বিপরীতে মুজাহিদ ছিলেন ১ জন)।

চেচেন যুদ্ধের সময় (১৯৯৪-১৯৯৬) রাশিয়ানরা ১ লাখ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। অন্যদিকে মুজাহিদদের সংখ্যা কখনো ১৩ হাজার অতিক্রম করেনি। অর্থাৎ মুজাহিদদের সংখ্যার সাথে রাশিয়ান সৈন্য সংখ্যার অনুপাত ছিল ১:৭.৭ (অর্থাৎ প্রায় ৮ জন রাশিয়ান সৈন্যের বিপরীতে মুজাহিদ ছিলেন মাত্র ১ জন)

চেচেন যুদ্ধের এক পর্যায়ে রুশ সেনাবাহিনী ৫০ হাজার সেনা নিয়ে চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনি অবরোধ করে। সে সময় চেচেন মুজাহিদরা সংখ্যায় ছিলেন ৩ হাজারের কাছাকাছি। ১৯৯৫ সালে চেচেন মুজাহিদরা কেবল অবরোধ ভেঙেই ক্ষান্ত হননি, বরং রাশিয়ান বাহিনীর উপর এমন পাল্টা আক্রমণ করেছিলেন যে রাশিয়ানরা বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতিসহ পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রথম চেচেন যুদ্ধে এইভাবেই মুজাহিদরা তাদের সক্ষমতা এবং সাহস প্রদর্শন করেছিলেন। তারা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যুদ্ধের মাঠের যে সকল নিয়মকানুনগুলো সাধারণত যুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর অনুপস্থিতি বা দুর্বল অবস্থানে থেকেও যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব। একইভাবে, মিডিয়া, রাশিয়ানদের সামরিক অবস্থান, কৌশলগত দিক এবং অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে চেচেন মুজাহিদদের গভীর জ্ঞান এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, কীভাবে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে হয় তা তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানেন।

সুতরাং, পূর্বের ঘটনাগুলো থেকে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট যে, সংখ্যা ও শক্তিতে মুজাহিদদের থেকে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও অনেক পরাশক্তি নির্মম পরাজয় বরণ করেছে মুজাহিদদের হাতে। যদিও দুই দলের মধ্যে সংখ্যা ও শক্তিতে বিপুল ব্যবধান বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মুজাহিদরা ঠিকই বিজিয় ছিনিয়ে এনেছেন।

উপরোক্ত প্রমাণাদি থেকে এটি সহজেই বোঝা যায়, কাপুরুষ আলোচক টিভিতে মুজাহিদদের সম্পর্কে যে দাবিগুলো করেছিলো তা একেবারেই ভিত্তিহীন। এখন, কেউ কেউ হয়তো একথা বলে আপত্তি জানাতে পারে যে, পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোতে আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয়/অঞ্চলভিত্তিক সকল দল একত্রিত হয়েছিল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে ছিল। কিন্তু আল-কায়েদার ক্ষেত্রে তো এমন নয়। আল-কায়েদা লড়াই করে বিদেশের মাটিতে যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে থাকে না। তাই আগে যেভাবে জিহাদী দলগুলো হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল এখন আল-কায়েদার পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব না।

আমরা তাদের এই আপত্তির জবাবে বলে থাকি – প্রথমত, আল-কায়েদা একা নয় বরং আল-কায়েদা, তালেবানদের পাশে থেকে, তাদের সহযোগী হয়ে লড়াই করছে। তালিবানরা আফগানিস্তানের অধিবাসী। দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই

আল-কায়েদার মুজাহিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, তারা গতানুগতিক সেনাবাহিনী বা রাজনৈতিক দল ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম।

আর ঠিক একারণেই আমেরিকা আল-কায়েদার উপর প্রতিশোধ নিতে এতটা তৎপর। আল-কায়েদা আমেরিকানদের বানানো নিয়মে খেলতে চায়নি। এমনকি তারা নিজেরাই খেলার নিয়ম বানিয়েছে। একমাত্র আল-কায়েদাই ৯/১১ এর বিমান হামলার মাধ্যমে আমেরিকানদের কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্তম্ভগুলো গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকানদের চূড়ান্তভাবে অপমানিত করেছে। আল-কায়েদা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্য কোনো শত্রুপক্ষ এই ধরণের অপমান ও আতঙ্ক আমেরিকানদের উপহার দিতে পারেনি!

আমেরিকার প্রতিরক্ষা কৌশলের মূল ভিত্তিগুলো হল:

১. প্রারম্ভিক সতর্কতা (ঘটনার পূর্বেই সতর্ক হয়ে যাওয়া।)

২. আগাম আক্রমণ (যে কোনো আক্রমণ হবার আগেই যেখান থেকে আক্রমণ হবার সম্ভাবনা আছে সেখানে হামলা করা।)

৩. নিবৃত্তকরণের নীতি

মার্কিন প্রতিরক্ষা কৌশলের প্রথম স্তম্ভ অর্থাৎ প্রারম্ভিক সতর্কতা। আক্রমণ আসার পূর্বেই জেনে ফেলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া। আল-কায়েদার ৯/১১ এর আক্রমণ ছিল একেবারেই আকস্মিক আক্রমণ। আমেরিকা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ইতিহাসের কয়েকটি সফল আকস্মিক আক্রমণের (Surprise Attack) একটি ছিল এই আক্রমণ।

৯/১১ এর পূর্বে, ইতিহাসের সফল আকস্মিক আক্রমণগুলোর মধ্যে রয়েছে – ১৯৪১ সালে জাপান কর্তৃক আমেরিকার পার্ল হারবারে আক্রমণ, ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ, ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণ এবং ১৯৭৩ সালে মিশরীয় বাহিনী কর্তৃক ইহুদীদের বার লেভ লাইন অতিক্রম করে চালানো আক্রমণ।

তবে ১১ই সেপ্টেম্বরের অভিযান আমেরিকার বুকে যে ক্ষত তৈরি করেছিল সে হিসেবে এটি পূর্বের সকল আকস্মিক আক্রমণকে হার মানিয়েছে। এই একটি মাত্র অভিযান আমেরিকাকে তার দেশের সকল অধিবাসীদের নিয়ে মানসিক ও শারীরিক ভাবে 'যেকোনো সময় যেকোনো কিছু হতে পারে' এমন এক প্রস্তুতি নিতে বাধ্য করেছিল। বিষয়টা আমেরিকার জন্য সহজ ছিল না। আমেরিকাকে মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। অথচ এই মূল্য দেবার জন্য আমেরিকানরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ১৮৬১-১৮৬৫ সালের আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর এ ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন আর হয়নি মার্কিনিরা।

আমেরিকান নেভি পুরোপুরি সজাগ ছিলো এমন অবস্থাতেই আল-কায়েদা ইয়েমেনের এডেন বন্দরে তাদের ওপর আক্রমণ করেছিলো ২০০০ সালে। মার্কিন রণতরী USS Cole এর ওপর আঘাত হেনে অসংখ্য হতাহতের ঘটনা ঘটিয়েছিলো। মার্কিন নেভিই যখন প্রস্তুত থাকার পরেও আক্রমণের শিকার হয়েছে, সেখানে সাধারণ সমাজের লোকজন প্রস্তুতি নিয়ে কী সন্ত্রাসী আক্রমণ রুখতে পারবে? চরম স্নায়ুচাপে ভুগেছিল আমেরিকানরা।

আমেরিকার প্রতিরক্ষা কৌশলের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল আগাম আক্রমণ। সেপ্টেম্বরের হামলায়, প্রতিরক্ষা কৌশলের প্রথম ভিত্তির মতো এটিও বড় রকমের ধাক্কা খায়। দ্বিতীয় ভিত্তিটি প্রথম ভিত্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই প্রথম ভিত্তিটি ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় ভিত্তিটিও স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে, আমেরিকা ৯/১১ হামলার পূর্বেই হামলার ব্যাপারে তথ্য হাতে পেয়েছে। অর্থাৎ প্রারম্ভিক সতর্কতা ধাপটি সফল হয়েছে। এখন তাহলে দ্বিতীয় ধাপ আসে – আগাম আক্রমণ। অর্থাৎ প্রারম্ভিক সতর্কতার পর এখন আমেরিকাকে আগাম আক্রমণে যেতে হবে। এখন আমেরিকার পক্ষে কীভাবে সম্ভব এমন এক দলের বিরুদ্ধে আগাম আক্রমণ চালানো যারা গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে খুব দ্রুতই তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে? আমেরিকা কীভাবে এমন এক দলের উপর আক্রমণ চালাবে যাদের স্থায়ী কোনো সদর দফতর নেই?

আমেরিকার প্রতিরক্ষা কৌশলের তৃতীয় ভিত্তি ছিল – নিবৃত্তকরণের নীতি । এমন কিছুর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি দেখানো যেন সে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে। মার্কিন প্রতিরক্ষা কৌশলের এই নীতি সেইসব মানুষদের ক্ষেত্রে মুখ থুবড়ে পড়ে যারা বেঁচে থাকার চাইতে শহীদ হয়ে যাওয়াকেই বেশি ভালবাসেন। নিবৃত্তকরণের নীতি বিবাদমান দুপক্ষের 'অস্তিত্ব বজায়' এবং 'স্বার্থরক্ষা' – এ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রগুলোর কাছে এ দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। নিবৃত্তকরণের নীতি এক্ষেত্রে সফল। কিন্তু এটা এমন এক দলের ক্ষেত্রে কাজ করেনা যাদের স্থায়ী কোন সদর দফতর নেই, পশ্চিমা ব্যাংকগুলোতে মোটা অংকের মূলধন জমা নেই এবং যারা কোনো রাষ্ট্রের সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল নয়। কোনো রাষ্ট্রের ওপর যেহেতু নির্ভরশীল নয়, তাই আল-কায়েদা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। সংঘর্ষে জড়াতে পারে। কোনো একজনের কাছে যখন মৃত্য সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয় তখন তাঁকে কীভাবে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে নিবৃত করা সম্ভব? আমেরিকান প্রতিরক্ষা কৌশলের তিনটি ভিত্তিকেই সফলভাবে ভেঙ্গে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানদের তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মনস্তাত্বিক পরাজয়ের স্বাদ উপহার দিয়েছে আল-কায়েদা।

একজন পশ্চিমা সমরবিদের মতে – 'শত্রুকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে পরাজিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো -তাকে এমন স্থানে আঘাত করতে হবে যেখানে শত্রু নিজেকে নিরাপদ মনে করে। থাকতে স্বস্তি পায়'। ৯/১১ হামলার ক্ষেত্রে আল-কায়েদার মুজাহিদরা ঠিক এটাই করেছিলেন।

আমেরিকা এবং মুজাহিদদের সামরিক শক্তির অসমতা নিয়ে টিভি চ্যানেলের সেই ভীতু, কাপুরুষ আলোচক জোর দিয়ে আলোচনা করছিলো। বলছিলো আমেরিকার সাথে মুজাহিদদের শক্তির অসমতা থাকার কারণে আমেরিকাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। কাজেই এখন জিহাদ করা যাবেনা। অথচ এই 'অসমতায়' পশ্চিমাদের বিশেষ করে আমেরিকার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে যথাযথ হাতিয়ার।

এ বিষয়টি এমন এক সময় উঠে এসেছে যখন আমেরিকানরা 'চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ' কৌশল নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছে। আর আমেরিকানদের এই হতবুদ্ধি অবস্থার দ্বারা মুজাহিদরা উপকৃত হচ্ছেন। বিশেষত উম্মাহর সেই সকল মানুষেরা উপকৃত হচ্ছেন যারা নতুন করে জিহাদ শুরু করেছেন। যাদের হারানোর কিছু নেই। প্রাত্যাহিক জীবনে যারা এতটাই অপমান-লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন, নতুন করে অপমানিত হবার আর কিছু নেই। আমেরিকা এবং পশ্চিমারা এই নতুন চ্যালেঞ্জের প্রকৃত স্বরূপ ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে। সেইসাথে তারা এটাও স্বীকার করছে যে – এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করা অত্যন্ত কঠিন। তারা বুঝতে পারছে নতুন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে, প্রচলিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, যুদ্ধশাস্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। সেইসাথে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়াদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। আমেরিকা বা পশ্চিমাদের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতি থেকে মুজাহিদরা ব্যাপকমাত্রায় লাভবান হচ্ছেন।

একইভাবে, ইসলামী আন্দোলনকারীদেরকেও ক্রুসেডারদের এই চলমান আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের কৌশলগুলো ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। যেন রণকৌশল সময়োপযোগী হয় এবং পর্যাপ্ত সামরিক প্রস্তুতি থাকে। উম্মাহকে তাওহীদের দিকে আহবান করা, ইসলামী আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানো ও রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলো একদিকে যেমন শরীয়তের দাবি, অন্যদিকে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ক্লোসভিটজ এবং মাও সে তুং এর মতো পূর্বের সমরবিদরাও এই কৌশলের কথা বলেছিল। তবে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ কৌশলের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ খুব সম্ভবত ফিলিস্তিনের 'ইন্তিফাদা'। এটি ফিলিস্তিনিদের উপর থেকে ইহুদীবাদী ইসরাইলী সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব বহুলাংশে কমিয়েছিল।

ইসলামী আন্দোলনকারীদের মিডিয়া কার্যক্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রোপাগান্ডা চালাতে হবে। কারণ এই জায়গাটাতে প্রোপাগান্ডা চালানোর মাধ্যমে, আমেরিকা ও তার দালালেরা সুস্পষ্টভাবে মুজাহিদদের চাইতে এগিয়ে আছে। তারা এতোটাই এগিয়ে আছে যে বিরোধী বা নিরপেক্ষ সকল মিডিয়ার কণ্ঠস্বর তারা থামিয়ে দিয়েছে। সকল মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। এতোটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মুজাহিদরা সামরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে বিশাল মনস্তাত্ত্বিক বিজয় লাভ করেছিলো তা ম্লান করে দিতে চাচ্ছে। তারা চাচ্ছে মুজাহিদদের সাহসিকতা, বীরত্ব যেন মুসলিম বিশ্বগুলোতে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে না পারে।

তাঁদের প্রতি মুসলিম উম্মাহর সহমর্মিতা ও ভালবাসা ধ্বংস হয়ে যায় । উম্মাহর যুবকেরা যেন মুজাহিদদের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে তাদের মতো হতে বা কিছু করতে না চায়।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন এই সকল ভীতু, কুফফারদের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাওয়া দাঈদের মিনমিনে, পরাজিত কণ্ঠস্বর বন্ধ করে দেন।আমরা আল্লাহর কাছে আরও দোয়া করছি তিনি যেন এই উম্মাহের মাঝে এমন একদল দা'ঈ পাঠান যাঁরা চতুর্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধে উম্মাহর সাহায্যকারী হবেন। উম্মাহকে এই বিষয়ে সতর্ক করবেন এবং উম্মাহকে এই যুদ্ধে বিজয়ের পথ দেখাবেন। (আমীন)

সুত্র- আল-আনসার ম্যাগাজিন, ২য় সংখ্যা, ১৫ যুলকা'দা ১৪২২ হিজরি, ২৮ জানুয়ারি ২০০২ ইংরেজি, পৃষ্ঠা: ১৫-২১

[1] ২০০১ এর শেষে বা ২০০২ এর শুরুতে